Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 87 – 97
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বর্ষা প্রসঙ্গ : 'বর্ষামঙ্গল', 'বৃক্ষরোপণ', 'হলকর্ষণ'

সুনেত্রা মজুমদার
গবেষক, ররীন্দ্র সঙ্গীত
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
ইমেইল : sunetramajumdar@gmail.com

Keyword
কবি, প্রকৃতি, শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, শিক্ষাধারা, গান, ঋতু উৎসব, বর্ষামঙ্গল, আশ্রমিক, ছাত্র-ছাত্রী।

Abstract
রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনে ও সাহিত্য জীবনে প্রকৃতির ভূমিকা সর্বজনবিদিত। বিশেষত তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীতে 'প্রকৃতি' অনেকক্ষেত্রেই রবীন্দ্র মানসের নিয়ন্ত্রক শক্তিরূপে কাজ করেছে। তাই তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি হয়ে উঠেছে উপলব্ধির ফসল। তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক গানগুলি এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 'প্রকৃতি' যে সকলের শিক্ষক এ কথা স্মরণে রেখেই তাঁর তপোবনের আশ্রমিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রহ্মচর্যাশ্রম 'শান্তিনিকেতন'। পরবর্তীকালে প্রকৃতি ও পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ, ত্যেজ, মরুৎ, ব্যোম) কে মূলধন করেই পল্লীউন্নয়ন ও শিক্ষার ভাবনায় রূপায়িত হয়- 'শ্রীনিকেতন' বিদ্যালয়। আর ঠিক সেই কারণেই শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের শিক্ষানীতি ও পাঠক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি বেশ কিছু নব্য চিন্তা-চেতনায় পরিপুষ্ট উৎসবের প্রচলন করেন, যেখানে প্রকৃতিই ছিল গুরুত্বের কেন্দ্র বিন্দুতে। গুরুদেব প্রচলিত প্রকৃতি উৎসব বা ঋতু উৎসবের গানে কোনও না কোনও শিক্ষনীয় দিককে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের ঋতু বিষয়ক গানের প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় যে – সংখ্যাগত দিক দিয়ে বর্ষা ও বসন্তের গান অন্যান্য ঋতু বিষয়ক গানের তুলনায় অধিক। এর অন্যতম কারণ কবির প্রিয় ঋতু বর্ষা। এই ঋতুকে ঘিরে তিনি মনের আনন্দে রচনা করে গেছেন একের পর এক গান। তবে পরিবেশ সচেতন রবীন্দ্রনাথ বর্ষণকে বৃক্ষ নামক প্রাণের জন্মলগ্ন বলে মনে করেছেন। আর পরিবেশ রক্ষায় অর্থাৎ বৃক্ষের বীজ থেকে চারার রূপ নেওয়া ও বেড়ে ওঠার প্রধান সময়কাল বর্ষা বলেই এর গুরুত্ব বোঝাতে তিনি আশ্রমিক শিক্ষায় পাশাপাশি অবশ্য পালনীয় বৃক্ষরোপণ ও তাদের যত্নের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে প্রচলন করেছেন বৃক্ষরোপণ ও বর্ষামঙ্গল নামক দুটি উৎসবের। ঠিক এর বর্ধিত অংশরূপে শ্রীনিকেতনের পল্লীশিক্ষার পাশাপাশি কৃষি প্রধান দেশের নাগরিক রূপে কৃষিকাজকে সম্মান জানাতে প্রচলন করেন হলকর্ষণ উৎসবটির। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ রূপের বর্ণনা যেমন কবিগুরুর প্রতিটি বর্ষা বিষয়ক গানের শ্রীবৃদ্ধি করেছে, তেমনি গানের অন্তঃকরণের বিশ্লেষণ করলে প্রতিভাত হয়েছে পরিবেশে ও মনুষ্যজীবনে প্রকৃতির গভীর প্রভাব। কবির এই মনন-চিন্তনকে সম্মান জানিয়ে তার শুভাকাঙ্খী ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের গোড়ার দিকের ছাত্ররা শান্তিনিকেতন ও খোয়াই প্রান্তরের মতো রুক্ষ - কাঁকুড়ে জমিতে তৈরী করেন কষ্টার্জিত সবুজের সমারোহ। বর্ষা বিষয়ক রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলির আংশিক ব্যাখা বিশ্লেষণে আরও বিস্তারিত ভাবে অনুভব করা যায় প্রকৃতিপ্রেমিক ও বর্ষামুগ্ধ কবির মনোজগতের প্রতিটি স্তরকে। তাছাড়া শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন

বিদ্যালয়গুলিতে উৎসবগুলি যে নিতান্ত আমোদ-আহ্লাদ বা মনোরঞ্জনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত না হয়ে জীবনমুখী শিক্ষার বাস্তব রূপায়ণ ছিল এবং আজও এই উৎসবগুলির প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা যে সমধিক তাও অনুভব করা যায় উল্লিখিত উৎসবগুলির ও তার গানগুলির কথা আলোচনা করলে।

Discussion

রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন অসামান্য সুরস্রষ্টা ও তাঁর ছিল অসাধারণ সাঙ্গিতিক পাণ্ডিত্য, যার মধ্যে অধিকাংশটাই তাঁর সহজাত এবং উপলব্ধিজাত। তাই তাঁর কাছে সহজাত স্বতঃফূর্ত প্রকৃতিকে কখনই অবান্তর-অপ্রয়োজনীয় বোধ হয় নি। বরং প্রকৃতির সঙ্গে কবি একাত্মতা অনুভব করেন ও নিজেকে প্রকৃতির অংশ বলেই মনে করেন। তাই আমরা নানাভাবে নানা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যেমন Nature Explore করি, তেমনি কবি সততই স্ব-এষনা করে চলেন। নিজের মাঝে নিজেকে খোঁজার সাথে তাই কোথাও একটা প্রকৃতিকেই খোঁজার প্রচেষ্টা করে চলেন তিনি। 'ছিন্নপত্রাবলী'তে প্রকৃতি সান্নিধ্য যে তাঁর সুরসৃষ্টি তথা সকল সৃষ্টির প্রেক্ষাপট তার উদাহরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ –

> "পাড়াগেঁয়ে মধ্যাহ্নের এই হাঁসের ডাক, পাখির ডাক, কাপড় কাচার শব্দ, নৌকো-চলা জলের ছল্ ছল্ ধ্বনি, দূরে গোরুর পাল পার করবার হৈ হৈ রব, এবং আপনার মনের ভিতরকার একটা উদাস আলস্যপূর্ণ স্বগত সংগীতস্বর কলকাতার চৌকি-টেবিল-সমাকীর্ণ বর্ণবৈচিত্র্যহীন নিত্য নৈমিত্তিকতার মধ্যে কল্পনাও করতে পারি নে।"[১]

ঠিক এই কারণেই কলকাতা থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে প্রকৃতির কোলে কবি আশ্রয় নিয়েছেন বারবার। কাশ্মীরের ডাল লেক হোক অথবা প্রান্তিকের খোয়াই প্রান্তর ... প্রাকৃতিক রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ তীব্রভাবে আকর্ষণ করত রবীন্দ্রনাথকে।

> "প্রকৃতির কাছে মানুষের যেখানে পরাজয়, কবি তা স্বীকার করে নেন।"[২]

বিভিন্ন মৌসুমী রাগ যা ভারতীয় সঙ্গীতে সংস্কার বশত চলে এসেছে, তাকে মেনে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ঋতু উৎসবের গানগুলিতে যেমন সুরারোপ করেছেন কবি, তেমনি ঋতুর সাথে রাগের যোগের কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই বলেই কবি নির্দিষ্ট ঋতুতে নির্দিষ্ট রাগের প্রয়োগের বাইরেও করেন অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আসলে প্রকৃতি ও মানুষের মনের সেতুটি শুধু সূক্ষ্মই নয়, ব্যাখ্যার অতীত। আর এই কথাটি তাঁর ঋতু উৎসবের আরও কয়েকটি গানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আলোচনা প্রসঙ্গে 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু' গানটি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

> "হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু
> ঘন মেঘের ভুরু কুটিল কুঞ্চিত,
> হল রোমাঞ্চিত বন বনান্তর –
> দুলিল চঞ্চল বক্ষোহিন্দোলে...
> ...কানন শঙ্কিত ঝিল্লিঝঙ্কৃত।।"[৩]

এই গানে কবির হৃদয়ে যেন প্রকৃতির মেঘ গর্জনের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত। আবার বিস্ময়ের ভ্রু-কুঞ্চন দেখা যাচ্ছে মেঘের কপালে। কবির বর্ষণমুখর প্রকৃতির রূপদর্শনের রোমাঞ্চ যেন বনানীর পাতার কাঁপনে প্রতিফলিত। বর্ষণ মুখর রাত্রির ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ যেন অভিসারগামী ত্রস্ত-শঙ্কিত প্রেমিকার হৃদয়ের উদ্বেলতাকে প্রকাশ করে। গানের কথায় ও ভাবে, বর্ণনায় ও রূপকল্পে প্রকৃতি ও কবি হৃদয়ের অধরামাধুরী এক রোমান্সের জন্ম দিয়েছে। অথচ লক্ষনীয় যে এই ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে কবি নিজের সত্তা, অর্থাৎ মনুষ্যসত্তার ব্যবহার করেন নি, বরং প্রকৃতির উপর মনুষ্যত্ব আরোপ করেছেন।

একই রকমের চিন্তার রূপায়ণ বর্ষার অপর একটি গানেও দেখা যায়। গানটি হল --

> "এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে
> এসো করো স্নান নবধারা জলে।।
> দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
> পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ --

... ঘন বরিষণে জল কলকলে এসো নীপবনে।"[৪]

এখানে বর্ষার নবধারার সাথে মানব হৃদয়ের আবেগের ঝরণাধারাকে একাত্ম হতেই কবির নীপবনে ছায়াবীথিতলে সকলকে আহ্বান। প্রকৃতির কৃষ্ণবর্ণ সজল মেঘের সাথে প্রেয়সীর ঘনকালো কেশের সমধর্মীতা অনুভব করেছেন কবি। কখনও নীলবর্ণ মেঘের সাথে প্রেয়সীর নীলবসনের একাত্মতা লক্ষ্য করেছেন তিনি। প্রেমিকার কাজল নয়নের সাথে কদম্ববৃক্ষের ছায়ার অভিন্নতা বা বৃক্ষতলে বিছিয়ে থাকা কদম্বফুলের সাথে প্রেয়সীর গলার যুথীমালার একাত্মতা অনুভব করেছেন কবি। এক্ষেত্রে বিচার্য্য যে প্রাকৃতিক সম্পদের ও প্রাকৃতিক গুণের দ্বারা কখনও মানুষ প্রভাবিত, কারণ সেই উন্মুক্ততা মানুষের নেই, পরিবর্তে আছে অন্তর্বন্ধতা ও অহং, তাই প্রকৃতির কাছে তাকে মাথা নত করতেই হয়। আবার ঠিক বিপরীত বিষয়টিও মানতেই হয়, তা হল মানুষের মধ্যে আছে সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি ও সাংগঠনিক শক্তি যা প্রকৃতিতে অনুপস্থিত। তাই শুধু বর্ষা নয়, প্রতিটি ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথেই কবির সহজ আদান-প্রদানের সম্পর্ক চলতেই থাকে।

শুধু বিষয়গতভাবে (Objectively) বিশ্বপ্রকৃতিকে কবি উপলব্ধি করেন নি, কবির নিজের দেহ-মন-সত্ত্বা ও বিশ্ব প্রকৃতিরই অংশ। কবির নিজের কথায় –

> "আমি যেন আলোতে তৈরী, বাণীতে গড়া, বিশ্বরাগিণীতে ঝংকৃত, জলে স্থলে আকাশে ছড়িয়ে যাওয়া।"[৫]

তাঁর সাঙ্গীতিক সত্তা যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতারই সর্বশ্রেষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ তার প্রমাণ তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক সকল গান। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির সাথে এই একাত্ম হওয়ার প্রয়োজনীয়তা যে প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে জরুরী তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, আর তাই তাঁর এই জীবনদর্শনকে তিনি প্রকৃতি বিষয়ক ঋতু উৎসবগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর ছাত্রদের মনের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। শ্রাবণের বর্ষণধারার সাথে একদিকে যেমন নেচে ওঠে চাতকপাখির দল, ময়ূর মেলে দেয় তার অপরূপ পেখম, শাল – পিয়াল – তাল - তমাল তাদের প্রশাখা দুলিয়ে নৃত্যের ভঙ্গিমায় আনন্দ জ্ঞাপন করে, তেমনি একই ভাবে নেচে ওঠে মানুষের মন ... নিম্নোক্ত গানে তারই বহিঃপ্রকাশ। আর ঠিক এই কারণেই বোধ হয় বর্ষামঙ্গলের সকল গানগুলিই প্রায় এমনই দ্রুত লয়ে বা ছন্দে বাঁধা, যেখানে প্রতিটি গানে নেচে ওঠে শান্তিনিকেতন - শ্রীনিকেতনের আশ্রমিকের দল। প্রতিটি গানেই পরিবেশিত হয় মানুষ ও প্রকৃতির মিলনোৎসবের আনন্দ প্রকাশক নৃত্য।

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে।
শত বরনের ভাব উচ্ছাস
কলাপের মত করিছে বিকাশ
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে
ওগো...।।"[৬]

গানের প্রতিটি পংক্তিতে মানব হৃদয়ের আনন্দ উৎসব প্রকৃতির রূপ পরিগ্রহ করেছে। আনন্দ যা একান্তই অনুভবজাত তার প্রতিফলন প্রকৃতিতে ঘটেছে। তাই কবি হৃদয়ের উচ্ছাস বিকশিত হয়েছে ময়ূরের কলাপের বিচিত্র সৌন্দর্য রূপে। ঝরকে ঝরকে ঝরে পড়া বকুল আর হাওয়ার করবী খসে পড়ার রূপকল্প দুটি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় বিবেচনাযোগ্য তা হল– প্রতিটি বর্ষামঙ্গলের গান। ঋতু উৎসবের কথা স্মরণে রেখে রচিত হলেও প্রতিটি গানের স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই Individuality র কথা স্বয়ং গুরুদেব তাঁর একটি রচনায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর একটি পত্র যা নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা সেখানে তিনি বর্ষামঙ্গল উপলক্ষ্যে রচিত একটি গানের কপি পাঠিয়ে সে প্রসঙ্গে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি লেখেন–

> "বলা বাহুল্য, বর্ষামঙ্গলের গানগুলি একটা একটা করে রচনা করা হয়েছে। যারা বইয়ে পড়বে, যারা উৎসবের দিন শুনবে, তারা সবগুলি একসঙ্গে পাবে। ...আমার মতে যেদিন একটি গান দেখা দিলে,

> সেইদিন তাকে স্বতন্ত্র অভ্যর্থনা করে অনেকখানি নীরব সময়ের বুকে একটিমাত্র কৌস্তভ মণির মতো ঝুলিয়ে দেখাই ভালো। তাকে পাওয়া যায় বেশি।''[৭]

কাজেই গুরুদেব তাঁর বর্ষা উৎসব তথা সকল ঋতু উৎসবের প্রতিটা গানকেই দ্যুতিময় মূল্যবান রত্নের গুরুত্ব দিয়েছেন, যা তাঁর উৎসবের মালাটিকে সাজিয়ে তুলত, আকর্ষণীয় করে তুলত। আর এই মণিমুক্তগুলি জড়ো করে পরম উৎসাহে তাকে মণিহার হিসেবে গড়ে তুলত আশ্রমিকদের একান্ত উদ্যোগ। কবিগুরুর প্রবর্তিত শিক্ষাধারার সার্থকতা এখানেই।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুউৎসবের মধ্যে প্রধান স্থান জুড়ে আছে বর্ষা ও বসন্ত ঋতু। কারণ কবির মননে প্রকৃতির যে অপরূপ সজীবতা শুধু সেই বিষয়টি বৃহৎ হয়ে ওঠেনি, তার সাথে সাথে বর্ষা ও বসন্তের মধ্যে আছে পরিবর্তনের হাতছানি, পুরাতন জীর্ণ অবস্থা ত্যাগ করে নবকলেবর রূপ ধারণের মধ্যে আছে গতিময়তা ও সৃষ্টির বার্তা। বর্ষনের প্রতিটি ফোঁটার মধ্যে একদিকে যেমন আছে ধুলি মলিনতাকে ধৌত করে দিয়ে লাবণ্যের সঞ্চার, ঠিক তেমনি অপর দিকে আছে বীজ বপনের মধ্যে দিয়ে প্রাণের সঞ্চার হবার উপযুক্ত আয়োজন। আর তাই 'বর্ষা' নামক প্রিয়তম ঋতুতে কবি একে একে রচনা করে গেছেন অভূতপূর্ব সব গান যা প্রকৃতির বর্ষণ স্নাত রূপকে উন্মোচিত করেছে। গ্রীষ্মের দাবদাহের পর বর্ষার জল পিপাসার্ত ধরিত্রী যেমন স্নিগ্ধ করে তুলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে, সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে, তেমনি মানবচিত্ত বর্ষণের রিমিঝিমি ছন্দে আকুল হয়ে ওঠে। প্রকৃতিপ্রেম ও মানবপ্রেম মিলেমিশে একাকার হয়ে ওঠে। আর রবীন্দ্রনাথের কবিমন এই বর্ষণমুখর ঋতুতে শুধু উচ্ছসিত হয়ে ওঠে তাই নয়, তাঁর পরিবেশ সচেতন মন বর্ষাঋতুকে বৃক্ষকুলের জন্মকাল ও বৃদ্ধিকাল বলেও পৃথক গুরুত্ব দিতে চায়। তাই সাহিত্যিকের প্রাকৃতিক প্রেম ও পরিবেশ-সচেতন সমাজবিদের বিচক্ষণতা মিলেমিশে রূপ দেয় দুই প্রধান ঋতু উৎসবের– 'বর্ষামঙ্গল' ও 'বৃক্ষরোপণ'। তাই শান্তিনিকেতনের ও শ্রীনিকেতনের শিক্ষাধারার সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে যায় এই ঋতু উৎসব গুলি। ডঃ নিতাই বসু তাঁর 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের উৎস সন্ধানে' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন নিয়ে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন এর উদ্দেশ্য রূপে চিহ্নিত করেছিলেন – ''মানবমনের সঙ্গে প্রকৃতির অচ্ছেদ্য বন্ধন''[৮] ঘটানোর বিষয়টিকে। তাঁর আলোচনায় আমরা আরও জানতে পারি যে ভুবনডাঙ্গা ও খোয়াই এর মতো অনুর্বর জমিকে শ্যামল শোভিত করা মোটেই সহজ কাজ ছিল না, বরং তা ছিল মরুপ্রান্তরের বুকে মরুদ্যান রচনার মতোই কষ্টকর। তবুও তাঁর প্রদর্শিত পথে, তাঁর রূপায়িত বর্ষামঙ্গল - বৃক্ষরোপণ উৎসবের মাধ্যমে কবির অনুগামীরা সেই অঞ্চলটিকে পরীক্ষামূলকভাবে সাফল্য অর্জনের সাহস দেখায়। গড়ে ওঠে আশ্রম সুলভ প্রাকৃতিক পরিবেশ। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে ছাতিমতলা, আম্রকুঞ্জ, বকুলবীথি। আর এই পরিবেশের সাথে একাত্ম হয়ে ওঠে তাঁর বর্ষাকেন্দ্রিক ঋতু উৎসবগুলি। শ্রীনিকেতন শিক্ষাধারাতেও অনুরূপভাবেই কৃষিকেন্দ্রিক পাঠক্রমের অঙ্গ হিসাবে প্রচলিত হয় 'হলকর্ষণ' উৎসবের। ''গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ নিজে হাতে হাল টেনে যে উৎসবের সূচনা করেন ১৯২৮ সালে''[৯] এবং শ্রাবণের যে কোনও একটি দিনে তাঁর জীবদ্দশায় পালন করা হত কৃষিভিত্তিক এই প্রতীকী উৎসবটি। রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে তা বৃক্ষরোপণ উৎসবের সাথেই পালিত হতে থাকে। দিনটিও নির্দিষ্ট হয় গুরুদেবের তিরোধান দিবস ২২শে শ্রাবণের পরের দিন অর্থাৎ ২৩শে শ্রাবণ নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয় এই ঋতু উৎসবটি।

পূজায় যেরূপ ফুল - চন্দন - নৈবেদ্য আবশ্যিক সামগ্রী হলেও প্রকৃত আবহ সৃষ্টিতে মন্ত্রের প্রয়োজন পড়ে এবং দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় তার মাধ্যমেই, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারায় সেরূপ নানা আয়োজনের মাঝেও উৎসবের প্রাণ সঞ্চারিত হয় গানের মাধ্যমে। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত উৎসব অনুষ্ঠান গুলিতে কবি কখনও উৎসব কেন্দ্রিক নির্দিষ্ট গানের যোগান দিয়েছেন নিজেই, কখনও আবার তাঁর রচিত ঋতু বিষয়ক গানগুলি, তা পরবর্তীকালে তাঁর 'গীতবিতান' সংকলনের 'প্রকৃতি' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেগুলিও উৎসবগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে তাৎপর্য্য অনুযায়ী।

বর্ষাকেন্দ্রিক ঋতুউৎসব-অনুষ্ঠানগুলিতে যে সকল গান পরিবেশিত হত, সে বিষয়ে ক্রমানুয়ায়ী আলোচনা করা যাক। বর্ষামঙ্গল –

> ''১৯২১ সালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি প্রাঙ্গনে প্রথমবার ১৭ ও ১৮ই ভাদ্র তারিখে আঠারোটি বর্ষার গান ও কয়েকটি আবৃত্তি সহযোগে অনুষ্ঠিত হয় বর্ষামঙ্গল যা কলকাতার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এক নতুন অভিজ্ঞতা।''[১০]

ঐ বৎসর বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে যে সকল গান পরিবেশিত হয়েছিল তা বর্ষার গান হলেও বর্ষণমুখর প্রকৃতিরূপে মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়ে লেখা নয়। বরং বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানটিকে তাৎপর্য্যপূর্ণ করে তুলতে বিশেষ উদ্দেশ্যেই রচিত। বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের 'বাদল মেঘে মাদল বাজে'[১১] গানটি গুরুদেব রচনা করেন ঐ অনুষ্ঠানের ঠিক তিনদিন আগে। একইভাবে অনুষ্ঠানটির আগে বর্ষামঙ্গল উপলক্ষ্যে লেখা হয় – 'তিমির অবগুণ্ঠনে'[১২], 'এই শ্রাবণের বুকের ভিতর'[১৩], 'ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের'[১৪], 'মেঘের কোলে কোলে'[১৫] ইত্যাদি গানগুলি।

বর্ষার মহিমা, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য বর্ণনার মধ্যেই নিহিত আছে বর্ষাকে আবাহনের তাৎপর্য এবং এই কথাটি যে কবির বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে পরিবেশিত সকল গানের সারগর্ভ তা গানগুলি ক্রমান্বয়ে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। প্রথমেই আলোচনা করা যাক – 'বাদল মেঘে মাদল বাজে' গানটি প্রসঙ্গে।

মানবহৃদয় যে প্রকৃতির ডাকে সর্বাধিক সাড়া দেয় তা কবির একান্ত নিজস্ব অনুভূতি। আর এই কথা এই গানটিতে যেমন প্রকাশিত হয়েছে, 'তারি গভীর রোলে আমার হৃদয় দোলে...' পংক্তিটির মধ্য দিয়ে, তেমনি অন্যান্য অনেক গানেই এই কথাটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মানুষের সুখ-আনন্দ, দুঃখ-যন্ত্রণা অনেকাংশে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত। আর বর্ষাঋতু প্রকৃতির সেই রূপ যেখানে মানুষের সকল অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ সব থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ধরা দেয়। বর্ষার কালো মেঘ মনের কোণে জমে থাকা দুঃখের সাথে, বিদ্যুতের চমক মানব মনের প্রতিবাদের সাথে, বর্ষনের ধারা মানুষের চোখের জলের সাথে একাকার হয়ে যায়। অনুরূপ ভাবেই বর্ষার গানে সেই সকল অভিব্যক্তিই প্রতিফলিত হয়। আলোচ্য গানটিতে স্থায়ী অংশে যেমন মনের আনন্দ প্রকাশিত হয়েছে বাদল মেঘে মাদল বাজার অনুষঙ্গে, ঠিক একই ভাবে অন্তরা অংশে মনের গোপন ব্যথা বর্ষার গানের রূপ পরিগ্রহ করে বনে বনান্তরে সজলবায়ের সাথে সাথে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। গানটিতে মানব মনের দুই বিপরীত অভিব্যক্তি আসলে বর্ষার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই পরিস্থিতির বহিঃপ্রকাশ। বর্ষা একদিকে গ্রীষ্মের দাবদাহের পর আনে শীতলতা। তৃষ্ণার্ত প্রকৃতি তৃপ্ত হয়। একই সাথে প্রাণীকুল বিশেষত বৃক্ষরাজী নবজীবন লাভ করে। শষ্যের ফলনের অনুকূল বর্ষা মানবজীবনে আনে সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও আনন্দ। বর্ষার এই ইতিবাচক দিকটির পাশাপাশি আছে নেতিবাচক দিকও। অকাল বর্ষণ বা অতিবর্ষণ পশুপাখী কীটপতঙ্গ তথা মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, করে তোলে আশ্রয়হীন, স্বজনহারা। প্রকৃতি থেকে লব্ধ জীবন সম্পর্কে এই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথ খুব সহজে তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষাধারার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আর সেই শিক্ষাকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলতে তিনি প্রবর্তন করেছিলেন বর্ষামঙ্গল – বৃক্ষরোপণ - হলকর্ষণ উৎসবের এবং এই উৎসবের গানের ভিতরেই অন্তর্হিত ছিল উৎসব প্রণয়নের উদ্দেশ্য।

উৎসব যদি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তার তরণীস্বরূপ হয়, তবে সেই তরণীর পাল হল তাঁর গানগুলি। আর গানের প্রতিটি পংক্তি ব্যাখ্যা করলেই স্পষ্ট হয় যে, কিভাবে তাঁর প্রচলিত প্রকৃতি-সান্নিধ্যের শিক্ষালয়ের পাঠক্রমটি জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হয়েছিল শিক্ষার্থীদের কাছে। অর্থাৎ পালে হাওয়া লেগে তরণী শুধু গতিলাভ করেনি, জীবনের সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছিল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে। "এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে"[১৬] গানটির অন্তঃসার অনুধাবন করলে আশ্চর্য হতে হয় যে জীবনের কোন গহীন উপলব্ধি থেকে কবি গানটির পংক্তিগুলি সাজিয়েছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে কবি নিছক নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে অথবা কাব্যচর্চা করতে ঋতু উৎসবের প্রবর্তন করেননি। মানবজীবনে প্রকৃতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রভাবকেই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাই বর্ষামঙ্গলে পরিবেশিত আলোচ্য এই গানটি বিশ্লেষণ করলেও আমরা বর্ষার ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ ও মানবজীবনে তার ছায়াপাত লক্ষ্য করি। শ্রাবণের অবিরাম বর্ষণের আগে যেমন কালোমেঘের বুক চিরে নামে বিদ্যুৎ, তেমনি মানবজীবনের বানভাসি কান্নার পিছনে লুকিয়ে থাকে অশনির আগুন। কবি তাঁর 'মৃত্যুঞ্জয়' নামক কবিতায় মানবজীবনের নিষ্ঠুরতম সত্য – মৃত্যুকে দেখেছিলেন উদ্যত অশনিরূপে। যদিও কবি মৃত্যুভয় থেকে কীভাবে উত্তীর্ণ হতে হয়, তার দিকদর্শন করেছেন, কিন্তু কঠিন আঘাতগুলি যে জীবনের সব রঙকে মুছে দিয়ে অগ্নিদগ্ধ কালো রঙে রূপান্তরিত করে এবং তা যে প্রতিটি মানুষের জীবনে অনিবার্য্য তা ব্যক্ত হয়েছে নিচের দুই পংক্তিতে।

"ও তা শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে ওই দিগন্তরে,

তার কালো আভার কাঁপন দেখো তার বনের ওই গাছে গাছে।"

প্রকৃতি ও মানবজীবন একে অপরের প্রতিচ্ছবি। তাই প্রবল বর্ষণধারাকে যেমন লেলিহান শিখা বলে দৃষ্টিভ্রম হয়, তেমনি মানবজীবনের হাসি-কান্নার সূক্ষ পার্থক্য অনেক সময় একাকার হয়ে যায়। বর্ষণের উন্মত্তরূপের প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে মানব মনের নানা বিকারের সংকেত। তার গানটির সঞ্চারী অংশে সেই কথাই বলেছেন কবি।

অনুরূপভাবে "ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়াতরীর মাঝি।"[১৭] গানটিতে শ্রাবণের ক্রন্দনরত রূপটিকে প্রত্যক্ষ করি। তাই শ্রাবণের পূবহাওয়াকে কবি 'অশ্রুভরা' বলেছেন। কবি খুঁজে ফিরেছেন তার হারিয়ে যাওয়া শৈশবের আনন্দ মুহূর্তগুলিকে, আশা করেছেন তাঁর ভোরবেলার সাথীকে গোধূলি বেলায় ফিরিয়ে দেবে শ্রাবণ। কিন্তু সজল মেঘের ধারাবর্ষণ শুধুই স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনে। বাস্তবে ফেরেনা হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলি। গানের শেষ দুই পংক্তি সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

"তাই তোমারি সারিগানে সেই আঁখি তার মনে আনে,
আকাশ ভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি।।"

বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে একই সময়ে কবি আরও একখানি গান রচনা করেন – 'মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাঁতি।' এখানে বকের সারির ঘর ছেড়ে 'উধাও হাওয়ার পাগলামিতে' মেতে ওঠার মধ্যে একদিকে আছে নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার দুঃসাহসিক আনন্দ, আর একদিকে নিশ্চিত আশ্রয় হারানোর ইঙ্গিত। গানটির শেষ পংক্তি– 'ওরা দিনের শেষে দেখেছে কোন মনোহরণ আঁধাররাতি' এর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রভাবনার সেই ইতিবাচক দিকটি প্রতিধ্বনিত। অর্থাৎ বাস্তবের কঠিনতা ও সেই কঠিনতাকে সামলে জীবনের স্বাভাবিক গতি ও ছন্দ বজায় রাখা, অনেক সংগ্রামের পরেও জীবনকে উপভোগ করার শিক্ষা। যেমন প্রখর গ্রীষ্মের পরেই থাকে বর্ষার শীতল ধারা, আবার জলদগম্ভীর আকাশের বর্ষণ হয়ে ঝরে পড়ার পরেই নির্মল শরতের আকাশ ও রৌদ্রজ্জ্বল মিষ্টি সকালের উষ্ণ আমেজ, তেমনি উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখের রসায়নের নামই জীবন। আর এই পরম শিক্ষা যা ঋতু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি আমাদের দিয়েছে, সেই ঘটনাকেই উদযাপন করার নাম উৎসব। আর এই কারণেই ঋতু উৎসবগুলি আশ্রমিক শিক্ষাধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য গানগুলি যে বছর রচিত হয় ও শান্তিনিকেতন এর ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা জোড়াসাঁকো প্রাঙ্গনে পরিবেশিত হয়, তার পরের বৎসরের বর্ষামঙ্গল উৎসবের চিত্রটি ছিল ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ অনাড়ম্বর, চার্লস এনড্রুজ ও ইউরোপীয় অধ্যাপক ফার্দিনান্দ বেনোয়া ছাড়া এই উৎসবে অতিথি অভ্যাগত তেমন ছিল না। বর্ষণ মুখর সেই ২২ শে শ্রাবণের বৃক্ষরোপণ, বর্ষামঙ্গল উৎসবের ঠিক প্রাক্কালে কবি রচনা করেন বর্ষামঙ্গলের আরও একটি গান -

"আজ আকাশের মনের কথা ঝরো ঝরো বাজে।"[১৮]

গানটিতে আছে কবির নিজের সাথে একাত্মতা ও বর্ষণক্লান্ত নিঃসঙ্গতার মিশেল। এই গানটি কবি স্বকণ্ঠে পরিবেশনও করেছিলেন সেবারের বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে। প্রতিবৎসরেই 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠানটি আরও বৃহৎ ও ব্যাপক রূপ লাভ করছিল কবির নিত্যনতুন গান রচনার মধ্য দিয়ে ও সেই গানগুলি আশ্রমিক ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনা ও নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। তাই প্রতিবছর গুরুদেব এই অনুষ্ঠানটিকে নব কলেবরে উপস্থাপনের জন্য গান রচনা করেছিলেন ও বর্ষামঙ্গল শুধু অনুষ্ঠানের ঘরোয়া পরিবেশ এর মধ্যে সীমায়িত না থেকে সার্বজনীন এক উৎসবের রূপ লাভ করেছিল। এই ধারা অব্যাহত রেখে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী বর্ষামঙ্গলে (১৩৩২ বঙ্গাব্দের) আরও কয়েকটি সঙ্গীত যোগ করেন। সেগুলি হল –

১. "আকাশ তলে দলে দলে"[১৯]
২. "ধরণী দূরে চেয়ে"[২০]
৩. "আষাঢ় কোথা হতে আজ"[২১]
৪. "ছায়া ঘনাইছে বনে বনে"[২২]
৫. "কদম্বেরই কানন ঘেরি"[২৩]
৬. "শ্রাবণ বরিষণ পার হয়ে"[২৪]

৭. ''ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে''[২৫]
৮. ''পূব হাওয়াতে দেয় দোলা''[২৬]
৯. ''এই শ্রাবণবেলা বাদল ধারা''[২৭]
১০. ''গহন রাতে শ্রাবণ ধারা''[২৮]
১১. ''আজ কিছুতেই যায় না''[২৯]
১২. ''আজি ওই আকাশ-পরে''[৩০]
১৩. ''যেতে দাও গেল যারা''[৩১]
১৪. ''জানি জানি হ'ল যাবার আয়োজন''[৩২]
১৫. ''বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা''[৩৩]

উপরোক্ত গানগুলির বিশ্লেষণ ও আলোচনায় একটি সাধারণ বিষয় লক্ষ্যনীয়, তা হল-- বর্ষা ঋতুর সৌন্দর্য ও প্রকৃতিতে বর্ষার আগমনের ভূমিকা। মানবজীবনে বর্ষা ঋতুর বাহ্যিক ও মানসিক প্রভাবকে নানা দৃষ্টিকোন থেকে দেখেছেন কবি। তাই তার আগমনকে উৎসব রূপে উদযাপনের গুরুত্ব শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের শিক্ষাধারায় কতখানি তা প্রতিটি বৎসরের বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ প্রভৃতি ঋতু উৎসবগুলির বিস্তারিত পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উৎসবের প্রাণসঞ্চার করতে ও উৎসব-সুলভ মেজাজ অক্ষুন্ন রাখতে বর্ষাঋতুর ভাবনির্ভর গানই যে কেবল রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা নয়, বরং আঙ্গিকগত দিকটিকেও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছিলেন। তাই গানগুলি অন্তরে ও বাইরে – উভয় দিক থেকেই অর্থাৎ ঋতুর গান ও উৎসবের গান – এই দুই দৃষ্টিকোণ থেকেই যথার্থ করে তুলতে যত্নশীল হয়েছিলেন কবি। গানের কথাগুলি যেমন ভাবের বার্তাবহ হয়েছিল, তেমনি সুর-তাল-লয়ের পুনঃ পুনঃ পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে গানগুলিকে উদ্দীপক ও প্রাণোচ্ছল করে তুলেছিলেন। কখনও বর্ষা বিদায়ের ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে তালবিহীন বিলম্বিত লয়ে করুণ রসের সঞ্চার ঘটেছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পুরুষ কণ্ঠের উপযুক্ত বর্ষার গান হিসেবে রচনা করেছিলেন --''থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষণ''[৩৪] গানটি। আবার যষ্ঠীতালে রচিত ''তোমার মনের একটি কথা''[৩৫] – গানটি রচনার পরেই অনুপযুক্ত বিবেচনা করে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের গানগুলি থেকে সেটি বর্জন করেছিলেন। একই ভাবে ''আজ ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে''[৩৬] গানটি ষষ্ঠীতালে রচনার পর সেটি পুনরায় কাহারবা তালে প্রয়োগ করে লয়বৃদ্ধি করেছিলেন কবি এবং তা জনপ্রিয়তার সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গৃহীত হয়েছিল, তা বলাইবাহুল্য।

বর্ষামঙ্গলকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রী-সহকর্মীদের উৎসাহ উদ্দীপনা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেই সময়। দিনে দিনে রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বিষয়ে দাবী ও আবদার বৃদ্ধি পায় ছাত্র-শিক্ষকদের। রীতিমতো নিত্য নতুন গান আদায় করা হত ও আরও গানের দাবী জানানো হত। এরমধ্যে সর্বাগ্রে যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন শৈলজারঞ্জন। সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন উপযোগী ও দলবদ্ধ নাচের উপযোগী অপেক্ষাকৃত দ্রুত লয়ের একাধিক গানরচনা করেন রবীন্দ্রনাথ বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে পরিবেশনের কথা মাথায় রেখে। যেমন সেই বৎসর তিনি লিখেছিলেন – ''ওগো সাঁওতালী ছেলে''[৩৭], ''বাদলদিনের প্রথম কদমফুল''[৩৮] গান দুটি। পাশাপাশি শৈলজারঞ্জনের আবদারে রচিত হল বেহাগ, ইমন প্রভৃতি রাগের তান সম্বলিত গান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় –

বেহাগ রাগের বর্ষামঙ্গলের গান – ''আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে।''[৩৯]
ইমন রাগের বর্ষামঙ্গলের গান – ''এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও।''[৪০]
তান বিশিষ্ট বর্ষামঙ্গলের গান – ''আজ শ্রাবণের গগনের গায়।''[৪১]

ঐ সময় মোট বারোটি বর্ষামঙ্গলের গান রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। তার মধ্যে শৈলজারঞ্জনের অনুরোধেই তিনি রচনা করেন ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের গান। শৈলজারঞ্জনের অনুরোধ রাখতে পুনরায় রচিত হয় ''স্বপ্নে আমার মনে হল''[৪২] গানটি। এরপর ''এসেছিলে তবু আসো নাই''[৪৩] গানটি অমিতা ঠাকুরের উদ্দেশ্যে লেখেন কবি। ''এসেছিনু দ্বারে তব''[৪৪] এবং ''নিবিড় মেঘের ছায়ার মন দিয়েছি মেলে''[৪৫] গানগুলি লেখার পর আবারও শৈলজারঞ্জনের অনুরোধে একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যক গানগুলি লেখা হয়। সেগুলি হল --

কীর্তনাঙ্গের বর্ষামঙ্গলের গান – "পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে।"[৪৬]

বাউলাঙ্গের বর্ষামঙ্গলের গান – "শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে।"[৪৭]

কিন্তু এখানেই বর্ষামঙ্গলের গানের তালিকা সমাপ্ত হয় নি। তাই সেই বৎসর বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন হয় অনেক পরে। ততদিনে শৈলজারঞ্জন আরও চারটি গান দিয়ে সাজিয়ে অনুষ্ঠানটিকে ষোলকলায় পরিপূর্ণ করার প্রস্তাব জানান। তাঁর অনুরোধে বর্ষাকালের অনুপযুক্ত রাগ বাগেশ্রীতেও সুর দেন কবি।

বাগেশ্রী রাগের বর্ষামঙ্গলের গান – "সঘন গহন রাত্রি"[৪৮] এছাড়াও লেখা হয়– "আজি মেঘ কেটে গেছে সকাল বেলায়"[৪৯], "ওগো তুমি পঞ্চদশী"[৫০] ও সর্বশেষ – "যবে রিমিকি-ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা।"[৫১]

বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটি। দুটি অনুষ্ঠানকে একে অন্যের পরিপূরক বলা যায়। বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটি রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রকৃতিচেতনাসঞ্জাত যেখানে বৃক্ষকে কবি প্রাণের আদি প্রতীক বলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শুধু তাই নয়, বৃক্ষই সেই আদি-প্রাণশর্ত যা চিরন্তন বন্ধু হয়ে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। তাই শিশুবৃক্ষকে কবি আবাহন করেছেন অতিথি রূপে, পরম উপকারী বন্ধু রূপে, শিক্ষক রূপে, পরিত্রাতা রূপে।

'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত বৃক্ষ বিষয়ক কবিতাগুলি পরবর্তীকালে সুরারোপিত হয়ে স্থান করে নিয়েছিল গীতবিতানের আনুষ্ঠানিক পর্য্যায়ের গানরূপে। সেখানে বর্ষণমুখর প্রকৃতি যেন পথিকবন্ধু বৃক্ষের আগমনের পটভূমি প্রস্তুত করেছে। অতিথি সৎকারের অনুরূপ সমাদরে নূতন প্রাণ, চারাগাছগুলিকে সাড়ম্বরে স্থাপন করার যে বার্তা গানগুলিতে বর্ণনা দিয়েছেন গুরুদেব, বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা রূপায়িত করা হয় আশ্রম প্রাঙ্গনে। চতুর্দোলায় শিশুবৃক্ষদের যত্নে বহন করে আনা হয়। এমনকি সেই চারা-গাছেদের মাথায় ছাতা ধরে প্রখর সূর্যালোকের তাপ থেকে রক্ষা করা হয় এই উৎসবে।

এই অনুষ্ঠানের গানগুলি পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট হয় কবির এই অভিনব অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্দেশ্য। "মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শুন্যে"[৫২] গানটিতে গুরুদেব বৃক্ষকে 'প্রবল প্রাণ' বলে উল্লেখ করেছেন যে মরুভূমিকে জয় করে সবুজ বিপ্লব ঘটাবে; 'কোমল প্রাণ' বলে গুরুদেব তাকে অভিহিত করেছেন, কারণ ধুলিকনা ধন্য হবে বৃক্ষের আগমনে, বৃক্ষকে কবি 'মোহন-প্রাণ' বলেছেন ফুলে-ফলে-পল্লবে প্রকৃতিকে ভরিয়ে তোলার জন্য। 'পথিকবন্ধু' বলে কবি বৃক্ষকে বর্ণনা করেছেন, কারণ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বিস্তারে মানুষ শীতল ছায়া লাভ করবে। 'উদার প্রাণ' বলেছেন বৃক্ষকে কারণ বৃক্ষ শুধু প্রকৃতিকে দিয়েই যায়।

বৃক্ষকুলের অবদান ও প্রকৃতিতে বৃক্ষের গানের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে সুরে সুরে প্রতিধ্বনিত। উৎসবের গানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই সুচেতনার বার্তাই পৌঁছে দিয়েছেন আশ্রমবাসীর কাছে। আর আশ্রমবাসীরা সেই অনুষ্ঠানকে সাড়ম্বরে উদযাপন করে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে সার্বজনীন করে তুলেছে। অনুরূপ ভাবনা আমরা বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের অন্যতম গানেও দেখতে পাই।

"আয় আয়, আয় আমাদের অঙ্গনে"[৫৩] গানটিতে বৃক্ষকে আবাহন করা হয়েছে সহোৎসাহে। চারাগাছকে 'বালক তরুদল' বলে সম্বোধন করেছেন কবি। 'চল আমাদের ঘরে চল' – এই আহ্বানে বৃক্ষরাজিকে কাছে টেনে নিয়েছেন একান্ত আন্তরিকতায়। নবীন কিশলয়ের মস্তকে আশীর্বাদ স্বরূপ শ্রাবণধারা বর্ষিত হবার কামনাও করেছেন তিনি। এখানে বৃক্ষরোপণ ও বর্ষার আবাহন মিলেমিশে এক পরিপূর্ণ উৎসবের রূপ ধারণ করেছে যা মানবকল্যাণের মূল কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। একই ভাবে বৃক্ষরোপণ ও বর্ষামঙ্গলের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়েছে হলকর্ষণ উৎসবটি। শ্রীনিকেতনের মাটিতে যে শিক্ষাধারার প্রচলন রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, তা ছিল বঙ্গভূমির আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর এক সংশোধিত, বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক রূপ। কৃষিই যে ভারতবর্ষের তথা বঙ্গভূমি আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর মূল ভিত্তি স্তম্ভ – তা অন্তরে উপলব্ধি করেই থেমে থাকেন নি রবীন্দ্রনাথ। কৃষিকেন্দ্রিক জীবন ও জীবিকার শ্রীবৃদ্ধির জন্য যথাযথ পল্লীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সুরুল ও আশেপাশের অঞ্চলগুলিকে হাতে কলমে পল্লীশিক্ষার মডেলগ্রাম রূপে এগিয়ে নিয়ে যেতে ১৯২২ সালে এল্‌মহার্স্ট সাহেবের হাতে দায়িত্ব তুলে দেন তিনি। আর

সেই শিক্ষাধারার অবধারিত অঙ্গরূপে ১৯২৮ সালে প্রচলন করেন 'সীতাযজ্ঞ' নামে উৎসবের সেখানে স্বহস্তে হাল চালিয়ে একটি উৎসবের সূচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে তা 'হলকর্ষণ' উৎসব রূপে পরিচিত হয় ও শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উভয় স্থানেই বর্ষামঙ্গল উৎসবের পরবর্তী দিনেই এই উৎসব পালিত হতে থাকে। প্রায় শতবৎসরের ঐতিহ্যবাহী উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ছড়িয়ে দেন এক জনশিক্ষার বার্তা, যেখানে অন্নদাতা ধরিত্রীকে কিছু ফিরিয়ে দেবার কর্তব্যের কথা বলেন তিনি।

এই উৎসব উদ্‌যাপন ও তাঁর লেখা গান ছাড়া অসম্পূর্ণ মনে হওয়ায় তিনি এই উৎসবের তাৎপর্য্যপূর্ণ গান রচনা করেন। "গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ,"[৫৪] "ফিরে চল মাটির টানে"৫৫ এবং "আয় রে মোরা ফসল কাটি"[৫৬] গানগুলি এই অনুষ্ঠানে বর্তমানেও দলবদ্ধ নাচের সাথে আশ্রমিকরা পরিবেশন করে থাকেন। যার সাথে দুটি সুসজ্জিত বলদ দিয়ে চাষিরা কিছু জমি চষেন। সকলেই গান গাইতে গাইতে হাত লাগান হাল চালানোয়। গানগুলি প্রথমে বর্তমানে নবগীতিকায় সংকলিত হয়, তবে, বর্তমানে গীতবিতানের আনুষ্ঠানিক পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। গানগুলি বিশ্লেষণ করলে এই উৎসবের অন্তর্নিহিত বার্তার প্রতিধ্বনিই আমরা শুনতে পাব। 'মাটি'র ভূমিকা মানবজীবনে উপলব্ধি করলে তাঁকে মায়ের আসন দান করতে হয় অবশ্যই, কারণ মাটি আমাদের ধারণ করে, লালন করে, ভরণ-পোষণ করে নিঃশব্দে। এই মাটির বুক চিরে বীজ তার পাতা মেলে দেয়। বৃক্ষের জন্ম হয়, শষ্য উৎপন্ন হয়, ফুল তার রূপ-রস-গন্ধে ভরিয়ে দেয়। মাটিতে জন্ম নিয়ে মানব সন্তানকে পুনরায় মাটিতেই মিলিয়ে যেতে হয়। তাই মাটির কাছে আমরা প্রত্যেকে ঋণী। আর এই ঋণ শোধ করতেই তাকে আনন্দ-উৎসবে ভরিয়ে তোলা প্রয়োজন। বর্ষাকে আবাহন করে মাটির তৃষ্ণা দূর করতেই আমাদের পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা। মাটির দান দুহাত ভরে আশীর্বাদের মতো গ্রহণ করে মানুষ ধন্য, আর সেই দান হল শষ্য। এই শষ্য উৎপন্ন হলেই মানুষের অনাবিল আনন্দ উৎসব, নৃত্য-গীত। মানুষ তার শ্রম ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে মাটিতে সোনা ফলায়। আর জাদুকর প্রকৃতি তার বর্ষনধারায় রৌদ্রকণায় সেই সোনা ফলাতে সাহায্য করে। তাই ভালোবাসার মাটি পাকা ফসলের শোভায় সেজে ওঠে। এর থেকে বড় উৎসব পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রায় কবি একদিকে যেমন ছিলেন প্রকৃতিবেষ্টিত, অপরদিকে ছিলেন আশ্রম শিক্ষার্থী ও সহকর্মী পরিবেষ্টিত। তাই শুধু প্রকৃতি মুগ্ধতাই যে তার প্রকৃতি পর্য্যায়ের গানগুলির উৎসস্থল, এমনটা বলা যায় না। প্রাক্-শান্তিনিকেতন পর্বে প্রকৃতিমগ্ন কবি প্রকৃতির পৃথক ঋতুর পৃথক রূপ দেখে আবেগতাড়িত হয়ে অনেক গান লেখেন। আর বর্ষাঋতুর প্রতি তাঁর দুর্বলতা বা পক্ষপাতিত্বও যে পূর্ব থেকেই ছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় তার গানগুলিতে। কিন্তু শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্ম-বর্ষা ও বসন্ত ঋতুর স্পষ্ট রঙ-রূপ রবীন্দ্রনাথ সহ সমগ্র আশ্রমবাসীকে প্রভাবিত করে। আর প্রকৃতিকে দেখার ও উপলব্ধি করার সার্থক দৃষ্টিকোণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তৈরী করে দিতে পেরেছিলেন বলেই, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব শুধু পরিকল্পিত হয়েই রয়ে যায় নি, তা প্রয়োগমূলক শিক্ষা হয়ে উঠেছিল। জীবনবোধের এই সার্থক রূপায়ণ বা প্রকৃতিবান্ধব শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়নের স্তম্ভ স্বরূপ হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত সঙ্গীতমুখর বর্ষা ঋতুর উৎসবগুলি।

বর্ষাঋতুতে পালিত উৎসবগুলির মধ্যে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের শিক্ষাধারায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্রাবলী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৬৭, পৃ. ২৪৭
২. রায়, ড: সিতাংশু, রবীন্দ্রসাহিত্যে সংগীতভাবনা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা, মাঘ ১৩৯১, পৃ. ৯৪
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, পৌষ ১৩৮০, পৃ. ৪৬৬
৪. তদেব, পৃ. ৪৫৮
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ফাল্গুন ১৪২২, পৃ. ৫০৬
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, পৌষ ১৩৮০, পৃ. ৪৭০

৭. মুজতবা, আলী সৈয়দ, গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ৫৯
৮. বসু, ড. নিতাই, রবীন্দ্রসংগীতের উৎস সন্ধানে, সাহিত্যায়ন, কলকাতা, জুন ১৯৯০ (১৩৯৭), পৃ. ১৫১
৯. https://www.nilkantho.in/visva-bharati-university-20/
১০. বসু, ড: নিতাই, রবীন্দ্রসংগীতের উৎস সন্ধানে, সাহিত্যায়ন, কলকাতা, জুন ১৯৯০ (১৩৯৭), পৃ. ১৬১
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, পৌষ ১৩৮০, পৃ. ৪৪৩
১২. তদেব, পৃ. ৪৪৩
১৩. তদেব, পৃ. ৪৫১
১৪. তদেব, পৃ. ৪৪৩
১৫. তদেব, পৃ. ৪৫১
১৬. তদেব, পৃ. ৪৫১
১৭. তদেব, পৃ. ৪৪৩
১৮. তদেব, পৃ. ৪৫৪
১৯. তদেব, পৃ. ৪৪৪
২০. তদেব, পৃ. ৪৬৫
২১. তদেব, পৃ. ৪৪৪
২২. তদেব, পৃ. ৪৪৫
২৩. তদেব, পৃ. ৪৪৪
২৪. তদেব, পৃ. ৪৪৫
২৫. তদেব, পৃ. ৪৫৯
২৬. তদেব, পৃ. ৪৫৯
২৭. তদেব, পৃ. ৪৪৫
২৮. তদেব, পৃ. ৪৪৬
২৯. তদেব, পৃ. ৪৪৬
৩০. তদেব, পৃ. ৪৪৭
৩১. তদেব, পৃ. ৪৪৭
৩২. তদেব, পৃ. ৩৩৮
৩৩. তদেব, পৃ. ৪৫০
৩৪. তদেব, পৃ. ৪৬৯
৩৫. তদেব, পৃ. ৩১৫
৩৬. তদেব, পৃ. ৪৭৭
৩৭. তদেব, পৃ. ৪৭৫
৩৮. তদেব, পৃ. ৪৭৫
৩৯. তদেব, পৃ. ৪৭৬
৪০. তদেব, পৃ. ৪৭৬
৪১. তদেব, পৃ. ৪৭৭
৪২. তদেব, পৃ. ৪৭৭
৪৩. তদেব, পৃ. ৪৭৮

৪৪. তদেব, পৃ. ৪৭৮
৪৫. তদেব, পৃ. ৪৭৯
৪৬. তদেব, পৃ. ৪৮০
৪৭. তদেব, পৃ. ৪৭৮
৪৮. তদেব, পৃ. ৪৮১
৪৯. তদেব, পৃ. ৪৮০
৫০. তদেব, পৃ. ৪৮১
৫১. তদেব, পৃ. ৯০৮
৫২. তদেব, পৃ. ৬১১
৫৩. তদেব, পৃ. ৬১১
৫৪. তদেব, পৃ. ৫৪৯
৫৫. তদেব, পৃ. ৬১২
৫৬. সেনগুপ্ত, পীতম, রবীন্দ্রগানের আরও গল্প, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ৩১